অনুগ্রহপূর্বক মিলিয়ে নিন

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ—৬৪তম অধিবেশন
ভাষণ, শেখ হাসিনা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতিসংঘ, নিউইয়র্ক, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৯

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৪তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় আপনাকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন।

আমার বিশ্বাস, আপনার প্রাজ্ঞ ও দৃঢ় নেতৃত্বে এই অধিবেশন সর্বাত্মকভাবে সফল হবে।

একইসাথে আমি ৬৩তম অধিবেশনের সভাপতি মি. মিগেল ডি ইসকটো ব্রুকম্যানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি জাতিসংঘ মহাসচিব মি. বান কি মুন-এর প্রতি যাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে জাতিসংঘ নতুন প্রাণ পেয়েছে।

সম্মানিত সভাপতি,

৩৫ বছর আগে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই মঞ্চ থেকেই জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে প্রথম ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়েছিলেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। অঙ্গীকার করেছিলেন - বাংলাদেশ হবে একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও কল্যাণরাষ্ট্র। দৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন, গণতন্ত্র, সুশাসন, মানবাধিকার এবং আইনের শাসন সমুন্নত রাখার।

দুর্ভাগ্য, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতকদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু এবং পরিবারের ১৮ জন সদস্য। এরপর বাংলাদেশে স্বৈরতান্ত্রিক ও আধা-স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম হয়। ৯০ দশকের কিছু সময় বাদে গত বছর বিদেশ থেকে আমার দেশে ফেরা এবং গত বছরের ২৯শে ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত দেশে অসাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থা বজায় ছিল।

জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ২৯শে ডিসেম্বর একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আমার দল আওয়ামী লীগ বিপুল বিজয় অর্জন করে।

জনগণের এই বিপুল সমর্থন তাঁদের প্রত্যাশা পূরণে আমাদের দায়িত্ব অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

আমাদের সরকার ইতোমধ্যে আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আমাদের লক্ষ্য- বাংলাদেশকে জাতির জনকের স্বপ্নের সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করা।

সম্মানিত সভাপতি,

সব ধরনের বাধা-বিপত্তি মোকাবিলা করে বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। শিক্ষাকে, বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে, আমরা বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়েছি। জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ২০১০ সালের মধ্যে আমরা শতভাগ শিশুকে স্কুলে পাঠানোর অঙ্গীকার করেছি। প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ঘোষণা করা হয়েছে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হচ্ছে। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে এবং গ্রামের মাধ্যমিক পর্যায়ের মেয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বাংলাদেশ জেন্ডার বৈষম্য দূর করতে সক্ষম হয়েছে। আমরা ডিগ্রি পর্যায় পর্যন্ত মেয়েদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা চালুর চিন্তা-ভাবনা করছি। গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য/শিক্ষার বিনিময়ে টাকা' কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। ২০১৪ সালের মধ্যে পূর্ণ সাক্ষরতা অর্জন আমাদের লক্ষ্য।

আমাদের সরকার স্বাস্থ্যখাতের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। গত ২০০০ সালে আমরা জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করি। যাতে মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত কবার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। নিরাপদ মাতৃসেবা প্রদানের জন্য জাতীয় মাতৃস্বাস্থ্য কৌশল গ্রহণ করা হয়। আমরা শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫৪ থেকে ১৫-তে কমিয়ে আনতে চাই। সে কারণে, শতভাগ শিশুকে টিকা কর্মসূচির আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।

আগের মেয়াদে সরকার পরিচালনার সময় প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে প্রতি ছয় হাজার মানুষের জন্য একটি করে কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম। প্রস্তাবিত ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ৬ হাজার ক্লিনিক স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তী সরকার কর্মসূচিটি স্থগিত ঘোষণা করে। আমরা পুনরায় এ কর্মসূচি চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চালু করেছি। এগুলোর মধ্যে নগদ অর্থ ও খাদ্য সহায়তা, ক্ষুদ্র ঋণ এবং অন্যান্য দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি, সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি, প্রান্তিক, প্রতিবন্ধী এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগণের জন্য সহায়তা কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য।

আমাদের গত শাসনামলে বয়স্কদের জন্য ভাতা, দুস্থ মহিলাদের জন্য ভাতা, বৃদ্ধদের জন্য শান্তিনিবাস বা বৃদ্ধ-নিবাস, বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের জন্য কর্মসংস্থান ব্যাংক চালু করেছিলাম। ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য সরকারি জমিতে আশ্রয়নের ব্যবস্থা নিয়েছিলাম।

আমাদের সরকারের লক্ষ্য - প্রতিটি পরিবার থেকে কমপক্ষে একজন সদস্যকে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া। ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যসীমা ৪৫ থেকে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনতে বাজেটের প্রায় অর্ধেকেরও বেশি এখাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

সম্মানিত সভাপতি,

খাদ্য নিরাপত্তা আমাদের সরকারের জন্য সব সময়ই একটি উদ্বেগের বিষয়। আমাদের বিগত সরকারের সময়ে কৃষি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক কর্মসূচি গ্রহণের ফলে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছিলাম। এজন্য জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বাংলাদেশকে মর্যাদাপূর্ণ CERES পদকে ভূষিত করে। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের পর বাংলাদেশ আবারও খাদ্য ঘাটতির দেশে পরিণত হয়। এবার আমাদের সরকার জাতীয় খাদ্যনীতি প্রণয়ন করেছে যাতে সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তার বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া, নারী, শিশু ও বৃদ্ধরা যাতে অধিক পরিমাণে খাবার পায় এবং খাবারের দাম যাতে কম থাকে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আমরা জ্বালানি ও কৃষি উপকরণ, যেমন, সার, বীজ, কীটনাশক এবং পানি সেচের মূল্য হ্রাস এবং সরবরাহ নিশ্চিত করেছি।

আগামী নভেম্বরে রোমে খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনে কৃষি উন্নয়ন এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মতি আদায়ে বাংলাদেশ জোর প্রচেষ্টা চালাবে। খাদ্য নিরাপত্তা এবং উন্নয়ন এজেন্ডাকে সামনে নিয়ে যেতে হলে দরিদ্র দেশগুলোর প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে। এগুলোর মধ্যে অধিক পরিমাণে আর্থিক সহায়তা, টেকসই কৃষিনীতির বিষয়ে সমঝোতা, প্রযুক্তি হস্তান্তর, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য বিশেষ অগ্রাধিকারসহ কৃষি পণ্যের জন্য সমান এবং যুক্তিসঙ্গত বাণিজ্যিক নীতি এবং উন্নত বিশ্বের কৃষির ওপর থেকে ভর্তুকি প্রত্যাহার অন্যতম।

সম্মানিত সভাপতি,

বাংলাদেশ একটি সমুদ্র উপকূলবর্তী ব-দ্বীপ যার বেশিরভাগ এলাকাই নীচু। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের দেশ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের ভূমিকা অত্যন্ত নগণ্য, কিন্তু আমরাই এর অন্যতম প্রধান শিকার। অনিয়মিত বন্যা, সাইক্লোন, খরা এবং ভূমিকম্প আমাদের কৃষিকে বাধাগ্রস্ত করছে এবং পানিসম্পদ, স্বাস্থ্য, জ্বালানি এবং নগর উন্নয়নকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। প্রায় প্রতি বছরই মারাত্মক সাইক্লোন উপকূলীয় অঞ্চলকে বিধ্বস্ত করছে। ফলে অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি ঘটছে এবং হাজার হাজার মানুষ আকস্মিক সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে গৃহহীন হয়ে পড়ছে, সম্পদহানি হচ্ছে, নদী ভাঙন, ভূমি ধ্বস, ভূমি ক্ষয় এবং বনভূমি ধ্বংসের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ জলবায়ুর উদ্বাস্তুতে পরিণত হচ্ছে। তাঁরা ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলোতে ভিড় জমাচ্ছে।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হচ্ছে সমুদ্র-উচ্চতা এক মিটার বৃদ্ধি পেলে আমাদের দেশের ১৮ শতাংশ পানিতে নিমজ্জিত হবে এবং সরাসরি ১১ শতাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় একশ' কোটি মানুষ উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে। বাংলাদেশের প্রতি ৭ জনে একজন মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনের শিকারে পরিণত হবে।

এ অবস্থা মোকাবিলার জন্য বাংলাদেশ কাজ করে যাচ্ছে। আমরা সবগুলো বড় নদী ক্যাপিটাল ড্রেজিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ফলে নদীগুলোর স্বাভাবিক গতি বজায় থাকবে, নদীর পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ হবে, ডুবে যাওয়া কৃষি জমি পুনরুজ্জীবিত হবে। নদীগুলো নৌ-চলাচলের উপযোগী থাকবে। উত্তোলিত মাটি দ্বারা বাঁধ নির্মাণ করা হবে এবং সেগুলোকে সমুদ্র উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উঁচু করা হবে। ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জন্য ঘরবাড়ি নির্মাণ করা হবে যাতে তাঁরা শহরগুলোতে ভিড় না জমায়। ইতোমধ্যে ১৪ হাজার সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করা হয়েছে এবং আরও শেল্টার নির্মাণের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আমরা নিজস্ব অর্থায়নে একটি জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল গঠন করেছি। পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তাও অত্যন্ত জরুরি।

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকারক দিকগুলো হচ্ছে, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, কর্মসংস্থানের পরিবর্তন, খাদ্য, পানি ও ভূমির নিরাপত্তাহীনতা। ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ শুধু তাঁদের বাড়ি-ঘরই হারাবে না, হারাবে আত্মপরিচয়, জাতীয়তা, তাঁদের অস্তিত্ব এবং কোন কোন সময়ে প্রিয় দেশকে। আগামী ডিসেম্বরে আমরা কোপেনহেগেনে COP-15-এ মিলিত হ'ব। এ সম্মেলনে আমাদের কয়েকটি বিষয়ে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করতে হবে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ তহবিলের নিশ্চয়তা বিধান, পরিবেশবান্ধব এবং গ্রহণযোগ্য প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমণ হ্রাসের সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকারের বিষয়ে সমঝোতায় পৌঁছাতে হবে। বাংলাদেশ COP-15-এ UNFCC প্রটোকল অনুযায়ী জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য একটি নতুন আইনগত ভিত্তি অনুমোদনের আহ্বান জানাবে যাতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উদ্বাস্তুদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক পুনর্বাসন নিশ্চিত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে সহায়তা কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিকভাবে যে তহবিল গঠন করার প্রস্তাব করা হয়েছে তার প্রতি আমার অকুণ্ঠ সমর্থন জানাচ্ছি। এই তহবিল বৈশ্বিক পরিবেশ উন্নয়নের জন্য অর্থায়নের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে পরিগণিত হবে। কোপেনহেগেনে COP-15-এ এই বৈপ্লবিক প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য গভীরভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন।

জলবায়ু পরিবর্তন রোধে যে ব্যবস্থাসমূহ নেওয়া হয়েছে তা যেন বিশ্বব্যাপী জ্বালানি ঘাটতি কমাতে গৃহীত উদ্যোগগুলোকে কোনভাবেই বাধাগ্রস্ত না করে সেদিকেও এই সম্মেলনকে নজর রাখতে হবে। পাশাপাশি উপকূল অঞ্চলের দেশসমূহ, ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর প্রয়োজন অনুযায়ী পূর্বের অনুমিত ও আইনগত প্রতিশ্রুতিগুলোকে ২০১২ পরবর্তী চুক্তিতে সংযোজিত করা উচিত।

বর্তমানে গোটা বিশ্ব এক অর্থনৈতিক মন্দার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। গত শতাব্দীর ত্রিশ দশকের পর এ ধরনের পরিস্থিতি এবারই প্রথম। আমি মনে করি, ন্যায় ও সমতার প্রতি উদাসীনতা এবং সময়ের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যবস্থা না নেওয়ার ফলে এই সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে। এই সঙ্কটের ফলে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা দেশসমূহ সবচাইতে বেশি ক্ষতির শিকার হয়েছে।

রপ্তানী কমে যাওয়া, রেমিট্যান্স কমে যাওয়া, ঋণ খেলাপী বেড়ে যাওয়া, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার সঙ্কুচিত হওয়া, বেকারত্ব ও দারিদ্র্য বেড়ে যাওয়ার মত সঙ্কট বাংলাদেশকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে। বিশ্ব আর্থিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আশু পুনর্গঠন এখন সময়ের দাবী। বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ এর মত প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য অংশীদারী মূলধনের ভিত্তিতে ভোটদানের ক্ষমতার যে ব্যবস্থা রয়েছে তা পরিবর্তন করতে হবে।

আর্থিক প্রনোদনা প্যাকেজ বৈশ্বিক চাহিদাকে সমর্থন যোগাবে এবং ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই সহযোগিতা করবে। এছাড়া উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলোর উদার বাণিজ্যনীতি যেমন শুল্কমুক্ত, কোটামুক্ত বাজার সৃষ্টি এবং বাণিজ্য সক্ষমতা উন্নয়ন তাদের দুর্দশা লাঘবে সহায়ক হবে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার দোহা ডেভেলপমেন্ট রাউন্ড এর ঘোষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রনোদনা প্যাকেজ হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে। ওডিএ ঘোষণা অনুযায়ী ২০১০ সালের মধ্যে ও ই সি ডি দেশগুলোর জাতীয় আয়ের ০.৭ শতাংশ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে এবং ০.২ শতাংশ স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে প্রদানের সময় এখন এসে গেছে যা ব্রাসেলস্ প্রোগ্রাম অব এ্যাকশনে পূণর্ব্যক্ত করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক মন্দার কারণে স্বল্পোন্নত দেশগুলো অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক উভয়ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ভীষণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। কারণ, রেমিটেন্স তাদের জিডিপির উল্লেখযোগ্য অংশের যোগান দেয়। মাইগ্রেন্ট কর্মীদের নতুনভাবে অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি এবং তাঁদের দেশে ফেরত পাঠানোয় অনেক দেশেই আর্থ-সামাজিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হচ্ছে। ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার উপায়গুলো এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ইমিগ্রেন্ট কর্মীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ নষ্ট না হয়।

মাননীয় সভাপতি,

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষাবাহিনীর অন্যতম বৃহৎ সৈন্য প্রেরণকারী দেশ হিসেবে ভূমিকা রাখতে পেরে বাংলাদেশ গর্বিত। বিশ্বের ২৪টি দেশে ৩২টি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে প্রায় ৮৩ হাজার সৈন্য প্রেরণ করে বাংলাদেশ বিশ্বশান্তি রক্ষায় নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছে। বর্তমানে জাতিসংঘ মিশনে বাংলাদেশের ৯ হাজার ৫৬৭ জন শান্তিরক্ষী কাজ করছে যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। আমাদের দেশের ৮৪ জন বীর শান্তিরক্ষী তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায়। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, এত অবদান এবং ত্যাগ সত্ত্বেও ডিপার্টমেন্ট অব পীস কিপিং অপারেশনস-এ বাংলাদেশের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব যথাযথ হয়নি। এমনকি শান্তি রক্ষা মিশনগুলোর পরিকল্পনা এবং কৌশলেও আমাদের কথা বলার সুযোগ নেই। আমরা সমানুপাতিকভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার দাবী জানাচ্ছি।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষার উদ্যোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে বাংলাদেশ. স্বাভাবিকভাবেই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সকলপ্রকার সন্ত্রাস সম্পর্কিত কনভেনশনের অংশীদার। ধর্ম অথবা কোন বিশ্বাসের ছদ্মাবরণে সন্ত্রাসের পক্ষে যারা যুক্তি প্রদর্শন করে আমরা তাদেরকে সর্বতোভাবে প্রত্যাখ্যান করি। জাতীয়ভাবে আমরা জঙ্গীগোষ্ঠী এবং তাদের মদদদাতাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। সারাবিশ্বে শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দিতে বাংলাদেশ জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনের "শান্তির সংস্কৃতি" শীর্ষক প্রস্তাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনের গত অধিবেশনে এই প্রস্তাবনা ১২৪টি দেশের সমর্থনে গৃহীত হয়েছিল।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারীতে মাতৃভাষা বাংলার জন্য ভাষা শহীদরা জীবন দিয়েছিলেন। সেদিনের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতি বছর এই দিন ইউনেস্কো বিশ্বের সকল ভাষার প্রতি সম্মান দেখিয়ে দিবসটি পালন করে। বাংলাদেশ ও ভারতের একটি প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গসহ বিশ্বের প্রায় ২৫ কোটি মানুষ বাংলায় কথা বলেন। সম্প্রতি আমাদের পার্লামেন্ট জাতিসংঘকে অনুরোধ করেছে বাংলাকে এর অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার জন্য। ভাষার শক্তির প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতীক হিসেবে বাংলাকে জাতিসংঘের অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে আমি সকল সম্মানিত সদস্যের সমর্থন কামনা করছি।

মাননীয় সভাপতি,

আমরা একটি দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে বসবাস করছি। আমাদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন, অর্থনৈতিক মন্দা ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের মত চ্যালেঞ্জকে। এসকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সকল মতভেদ ভুলে আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে। আসুন, আমরা একে অপরের দায়িত্ব, সমস্যা ও সম্ভাবনার অংশীদার হই। ভবিষৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর পৃথিবী রেখে যাই।

মাননীয় সভাপতি, আপনাকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক
জাতিসংঘ দীর্ঘজীবী হোক

……